ত্রিমুখী লড়াইয়ের জটিল অঙ্কে শুধু পছন্দই নয়, বাকি দু’দলের কাকে কতটা অপছন্দ, সেটিও গুরুত্বপূর্ণ

প্রশ্ন হল, একজন বাম ভোটারের কী করা উচিত?

বাকিরা কী ভাবছে, তার উপরই নির্ভর করছে কোনও বামমনস্ক ভোটদাতার জোটে ভোট দেওয়ার ফলাফল। লিখছেন **মৈত্রীশ ঘটক** ও **বিষাণ বসু**

এপি

লেনিন জিজ্ঞেস করেছিলেন, হোয়াট ইজ টু বি ডান বা, কিংকর্তব্য? তাঁর কথার সূত্র ধরে বলা যায় রাজ্যের আসন্ন নির্বাচনে বাম ও প্রগতিশীল মানসিকতার মানুষদের অবস্থা হল, কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তাঁরা রাজ্যে ক্ষমতায় থাকা দলের বিরোধী, আবার কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকা দলেরও বিরোধী। এ দিকে বামজোটের নির্বাচনে জিতে সরকার গঠন করার সম্ভাবনা কম। তা হলে তাঁদের কী করা উচিত?

এ বারের ভোট বিভিন্ন কারণেই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এখন দু’টি দলের মধ্যে যদি নির্বাচনী দ্বন্দ্ব হয়, সিদ্ধান্ত নেওয়া তুলনায় সোজা — আপনি যে দল বা জোটকে পছন্দ করেন (বা কম অপছন্দ করেন) তাকে ভোট দিলে মিটে যায়। সেখানেও সমস্যা হতে পারে যদি আপনার পছন্দের দল সরকারে থাকে এবং সরকারের কাজকর্মে একটা পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ জমে ওঠে। তা হলে তাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্যে আপনি বিরোধী পক্ষকে ভোট দিতে পারেন, যা খানিকটা হয়েছিল ২০১১ সালে। ত্রিপাক্ষিক নির্বাচনী প্রতিযোগিতা হলে সমস্যাটা আরও জটিল, কারণ আপনার (আপেক্ষিক ভাবে) পছন্দের দল বা জোট শুধু নয়, বাকি দুই পক্ষের প্রতি আপনার আপেক্ষিক বীতরাগ কতটা, সেটার একটা বড় ভূমিকা আছে। যে ভোটাররা মতাদর্শগত ভাবে কোনও ভাবধারার দিকে ঝুঁকে থাকলেও, কোনও নির্দিষ্ট দলেরই গোঁড়া সমর্থক নন (যাঁরা সব সময় তাঁদের পছন্দের পক্ষকে ভোট দেবেন), তাঁদের কী করা উচিত, এই সিদ্ধান্তটা সোজা নয়। নির্বাচন এবং ভোটদান নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যে তত্ত্ব আছে, তাতে একে কৌশলগত ভোটের সমস্যা বলা হয়।

তাই, প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ, অথচ উত্তরটা সোজা নয়। বাম মহলে এক দিকে ‘নো ভোট টু বিজেপি’, অন্য দিকে বামজোট, এঁদের মধ্যে এই নিয়ে অনেক বাদানুবাদও চলছে। এই নিয়েই আলোচনা করছিলাম দু’জনে। খুব একটা নিশ্চিত কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছনো না গেলেও সংশয়ের জায়গাগুলো-সহ আলোচনাটা সবার সামনে রাখছি।

বামমনস্ক ভোটারের চোখ দিয়ে যদি দেখি, তা হলে ধরা যাক, সবচেয়ে শ্রেয় বামজোট সরকার— কিন্তু তা এই মুহূর্তে খুব বাস্তব সম্ভাবনা নয়। তা হলে থাকে তিনটে সম্ভাবনা — তৃণমূল কংগ্রেস আগের থেকে কম আসন পেলেও একাই সরকার গড়তে পারবে, তৃণমূল বামজোটের সমর্থনে সরকার গড়বে, নয়তো বিজেপি সরকার গঠন করবে। আবার বিজেপির সরকার গঠন দু’ভাবে হতে পারে — হয় সরাসরি জিতে, না হলে নির্বাচনের আগেই যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, তার সূত্র ধরে তৃণমূল থেকে কিছু জয়ী বিধায়ক যদি দলবদল করেন। কিন্তু, এই এমএলএ ভাঙানোর ব্যাপারটা তখনই সম্ভব, যখন বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠতার ধারপাশে পৌঁছতে পারছে।

বামমনস্ক ভোটাররা নিশ্চয়ই দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি, অর্থাৎ বিজেপিকে ক্ষমতা থেকে দূরে রাখতে বামজোটের সমর্থনে তৃণমূলের সরকার, তাকেই বাকি দু’টি সম্ভাবনার থেকে বেশি চাইবেন। প্রশ্ন হল, বাকি দু’টির মধ্যে তুলনা কী রকম হবে। আমি যদি তৃতীয় সম্ভাবনাটিকে একদম এড়াতে চাই, এবং বাকি দু’টির মধ্যে কোনটার সম্ভাবনা কতটা সেটা যদি পরিষ্কার না হয়, তা হলে সমস্যা হল এই: ধরা যাক আপনি ঘোরতর বিজেপি বিরোধী এবং কোনও অবস্থাতেই তাদের ভোট দেবেন না, প্রতিবাদী ভোট হিসেবেও না, অর্থাৎ, যেটা ‘নো ভোট টু বিজেপি’-র অবস্থান। বিজেপির মতাদর্শ এবং সারা দেশে বর্তমান বিজেপি জমানায় যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে, সেখানে পশ্চিমবঙ্গও গেরুয়া শিবিরে চলে যাবার সম্ভাবনা তাঁদের কাছে তৃণমূল জমানা আরও পাঁচ বছর ফিরে আসার সম্ভাবনা যথেষ্ট অপ্রীতিকর হওয়া সত্ত্বেও বৃহত্তর বিপদ। এ বার যে আসনে বামজোট জিতবে না, সেখানে তাদের প্রার্থীকে ভোট দিলে বিজেপি জিতে যেতে পারে, রাজ্য সরকার-বিরোধী ভোট ভাগ হওয়ায়। তার মানে, এ ক্ষেত্রে বাম সমর্থকদের উচিত তৃণমূলকে ভোট দেওয়া, যা খুবই কষ্টকর একটা সম্ভাবনা।

সে ক্ষেত্রে, ব্যাপারটা এ রকম দাঁড়াচ্ছে — হয় আপনি যতটা তৃণমূল-বিরোধী, ততটা বিজেপি বিরোধী নন, নয়তো আপনি বিজেপি জিততে পারে, এই সম্ভাবনাটাকে ততটা গুরুত্ব দিচ্ছেন না। এই পরিপ্রেক্ষিতে আব্বাস সিদ্দিকির আইএসএফ-এর সঙ্গে বামফ্রন্ট এবং জাতীয় কংগ্রেসের জোটের যে সম্ভাব্য ফল, তা আশংকা জাগায় — প্রত্যক্ষ ভাবে তা তৃণমূলের সংখ্যালঘু ভোট কাটবে, আর পরোক্ষ ভাবে যাঁরা বামপন্থী হলেও তৃণমূল-বিরোধী বেশি, সেই ভোটারদের বিজেপিকে ভোট দেবার উত্তম অজুহাত জোগাবে।

পরিস্থিতিটা এতখানি সরল করে দেখার সমস্যা রয়েছে। ভোটটা সত্যি সত্যিই বিজেপি বনাম অ-বিজেপি হলে, আগে যে কথা বলা হল, সেটা অনিবার্য সত্য হয়ে দাঁড়ায় — অন্তত এই দফায়, বিজেপিকে ঠেকানোর সেরা বাজি তৃণমূল। কেননা, গোটা পঞ্চাশেক কী সত্তরটা আসনের বাইরে (খুব আশাবাদী মানুষের পক্ষেও একশো প্লাস আসন দেখতে পাওয়া মুশকিল) বামজোটের সাফল্য আশা করা কঠিন।

কিন্তু, নির্বাচন তো শুধু বিভিন্ন দল বা জোটের মধ্যে হয় না, সেখানে কোনটা ক্ষমতাসীন দল আর কারা তার বিপক্ষে, সেটা একটা বড় ভূমিকা নেয়। অর্থাৎ, এই নির্বাচনে অনেক ভোটারের কাছে ভোটটা হল তৃণমূল বনাম অ-তৃণমূল। সোশ্যাল মিডিয়ার বাইরে বেরিয়ে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সাথে কথা বলতে গিয়ে, এ বারের ভোটের মূল প্রেক্ষিতটা যে এই রাজ্যে সরকারে ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে-বিপক্ষের বাইরে আলাদা কিছু, সে রকম ভাবনা চোখে পড়ছে না। সে ক্ষেত্রে বামেদের দিকে ভোট দেওয়াটা তৃণমূলকেই কিছুটা সাহায্য করবে — কেননা, তৃণমূল-বিরোধী ভোটটা ভাগাভাগি হয়ে যাবে।

এ বার যদি আব্বাস সিদ্দিকি ফ্যাক্টরটা ভেবে দেখি, সেখানেও কিছু পরস্পরবিরোধী সম্ভাবনা চোখে পড়ছে।

যে যা-ই বলুক, সংখ্যালঘু জনসাধারণ একজোট হয়ে বিশেষ একটি দলকেই বেছে নেয়, এমনটা তো হয় না। গত লোকসভা নির্বাচনে, বেশ কিছু জেলায়, একটা বড় শতাংশ সংখ্যালঘু ভোট বিজেপি পেয়েছিল। বিশ্বাস করা শক্ত হলেও, কথাটা সত্যি। এঁদের পুরোটাই বাম ভোটার নয় — বেশ কিছুটা বিক্ষুব্ধ তৃণমূলও। এ ছাড়াও, ওয়াইসি-র মিম-এর সংগঠন এ রাজ্যে কিছুটা ছড়িয়েছে — তাঁদের সঙ্গে বিজেপির বোঝাপড়ার সুবাদেও কিছুটা সংখ্যালঘু ভোট বিজেপি পেয়েছে। লোকসভা ভোটের পরে, গত দু’বছরে, মিম-এর সদস্যসংখ্যা আরও খানিকটা বেড়েছে। সেই ভোট অনেকখানিই বিজেপির দিকে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এখন আব্বাস সিদ্দিকি আসায় হিসেবটা গুলিয়ে গিয়েছে। আবার আইএসএফ-এ আদিবাসী সংগঠনের উপস্থিতি, আদিবাসীদের মধ্যে বিজেপির অধুনা জনপ্রিয়তায় ভাঙন ধরাতে পারে। আর সিদ্দিকির সুবাদে তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কে ফাটল ধরার সম্ভাবনা তো রয়েছেই। এ জন্য বামজোটে আব্বাস সিদ্দিকির উপস্থিতি বিষয়ে তৃণমূল এবং বিজেপি উভয়েই সমান ক্ষুব্ধ। অন্য দিক থেকে দেখতে চাইলে, মেঠো ভাষায় আব্বাসের বক্তব্য এক দিকে শিক্ষিত মুসলমানদের, এবং আর এক দিকে বাম ভোটারদের যে অংশ মুসলমানদের সন্দেহের চোখে দেখে, এই দুই পক্ষকেই বামজোটের বিরুদ্ধে ঠেলে দিতে পারে। কাজেই, অঙ্কটা এমনিতেই জটিল — কিন্তু, আব্বাস সিদ্দিকি ঠিক কতখানি প্রভাব কোথায় কী ভাবে ফেলবেন, বা আদৌ ফেলবেন কি না, সেটা আঁচ করে হিসেব মেলানো প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আসলে বাকিরা কী ভাবছে, তার উপর কোনও বামমনস্ক ভোটারের জোটে ভোট দেওয়ার ফলাফলটা দাঁড়িয়ে আছে। বাকিরা যদি বিজেপিকে মূল শত্রু ভাবে, তা হলে বাম-সমর্থকের তরফে জোটে ভোট সেই লক্ষ্যের বিরুদ্ধে কাজ করে ফেলবে — অর্থাৎ বিজেপিকে ক্ষমতায় এনে ফেলার দায় তাদেরও থাকবে। আবার, বাকিরা যদি তৃণমূলকে মূল শত্রু ভাবে, বাম-সমর্থকের তরফে জোটে ভোট বিজেপিকে ঠেকাতে সাহায্য করবে, কিন্তু তৃণমূলকে ক্ষমতায় রাখার পক্ষে কাজ করবে।

অর্থাৎ, একজন বামফ্রন্টের সমর্থক বা কর্মী যখন জোটে ভোট দেবেন, সেই ভোটটা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটারের যা-ই মূল লক্ষ্য হোক না কেন (বিজেপিকে ঠেকানো, কিম্বা তৃণমূলকে সরানো), তার বিরুদ্ধেই যাবে। পরিস্থিতিটা খুবই অদ্ভুত।

আবার, আপনি যদি গত কয়েক বছরে কেন্দ্র ও রাজ্যের সরকারের কাজকর্ম দেখে বীতশ্রদ্ধ হন, তা হলে এ কথা নিশ্চয়ই মানবেন, প্রবল সংখ্যাগরিষ্ঠতা-প্রাপ্ত সরকার জনগণের পক্ষে খুব একটা সুবিধের ব্যাপার নয়। বামমনস্ক ভোটারদের কাছে তৃণমূল বনাম বিজেপি-র বাইরে একটা বিকল্প নীতির অনুসন্ধান জরুরি। একটা শক্তিশালী বাম কণ্ঠস্বর সে সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে। সে ক্ষেত্রে, এ বারের ভোট বাম কণ্ঠস্বরকে হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করারও ভোট।

মুশকিল এই, সব দিক বিচার করে, বৃহত্তর প্রেক্ষিতে, বাম-ভোটার ঠিক কোন বোতামটি টিপবেন? তার চেয়েও বড় মুশকিল, তাঁর পছন্দের বোতামটি ঠিক কোন অ্যাজেন্ডাকে সাহায্য করবে, এ নিয়ে সংশয় থেকেই যাবে। তাই, আর যা-ই হোক, সাম্প্রতিক ইতিহাসে এই বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা সবচেয়ে শক্ত!

একজন বামফ্রন্টের সমর্থক বা কর্মী যখন জোটে ভোট দেবেন, সেই ভোটটা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটারের যা-ই মূল লক্ষ্য হোক না কেন (বিজেপিকে ঠেকানো, কিম্বা তৃণমূলকে সরানো), তার বিরুদ্ধেই যাবে।

মৈত্রীশ ঘটক লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্সে অর্থনীতির শিক্ষক। বিষাণ বসু ক্যান্সার-চিকিৎসক